Talk delivered by Swami Samarpanananda at Ramakrishna Vivekananda University, before the students of Indian Spiritual Heritage Course –

(Transcribed and edited by Amit Ray Chaudhuri)

গায়ত্রীমন্ত্র

।। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।।

গায়ত্রীমন্ত্র হচ্ছে বেদের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র। পুরুষসূক্তম্‌ও বেদের একটি অন্যতম প্রধান মন্ত্র, সারা দেশের বহু মানুষ আজও রোজ এই পুরুষসূক্তম্‌ আবৃত্তি করে চলেছে। আর যারা শিবভক্ত তারা শিবের মন্ত্র – *ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্‌। উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মাহমৃতাৎ* এই মহামন্ত্র রোজ আবৃত্তি করেন, এই মন্ত্রটিও বেদ থেকে এসেছে, তাই এই মন্ত্র হচ্ছে বেদমন্ত্র। এই ধরণের বেদের কিছু কিছু মন্ত্র ভারতের বহু মানুষ এখনও প্রতিদিন আবৃত্তি করে। কিন্তু সবার থেকে গায়ত্রীমন্ত্রের বেশি পরিচিতি। বিভিন্ন ক্যাসেটের দৌলতে, আর আজকাল তো মোবাইলে ফোন করলেই এই গায়ত্রীমন্ত্র শোনা যায়, তাই এখন মোটামুটি প্রায় সবাই বিশেষ করে যারা হিন্দু পরম্পরাকে এখনও ধরে রেখেছেন তারা এই গায়ত্রীমন্ত্র প্রতিদিন জপ করেন।

গায়ত্রীমন্ত্র খুবই নৈর্ব্যক্তিক মন্ত্র, অর্থাৎ এই মন্ত্রে কোন দেবী বা দেবতার দিকে নির্দেশ করা নেই। যেমন স্বামীজী যে আরাত্রিক ভজন, 'খণ্ডন ভববন্ধন' রচনা করেছেন, এই স্তবটি বিশেষ কোন ঠাকুর দেবতার দিকে নির্দেশ করছে না। যদিও আমরা সবাই শ্রীরামকৃষ্ণের আরতির সময় সামনে বসে 'খণ্ডন ভব বন্ধন' গান করি, কিন্তু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই স্তবের কোথাও ঠাকুরের কোন নামের উল্লেখ করা নেই। খণ্ডন ভব বন্ধন আমরা শ্রীরামচন্দ্রের নামেও গাইতে পারি আবার শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করেও গাইতে পারি, আর পরবর্তি কালে যত অবতারই আসুক না কেন সবার উদ্দেশ্যেও গেয়ে দিতে পারব। স্বামীজীর এই আরাত্রিক ভজন একেবারের নির্বিশেষ ভজন। ঠাকুরের আরতির সময় রোজ গান করা হয় বলে এখন এই ভজন ঠাকুরের নামে হয়ে গেছে। ঠিক সেই রকম গায়ত্রীমন্ত্রও হল নির্বিশেষ মন্ত্র। কিন্তু গায়ত্রীমন্ত্রের সঙ্গে দুজনকে যোগ করে দেওয়া হয়েছে। প্রথম হল সূর্য দেবতা আর দ্বিতীয় হল গায়ত্রীদেবী, যার জন্য এই মন্ত্রের নামই হয়ে গেছে গায়ত্রীদেবী। কিন্তু সূর্য দেবতা বা গায়ত্রীদেবীর সাথে গায়ত্রীমন্ত্রের আদপেই কোন সম্পর্ক নেই। অথচ আমরা গায়ত্রীদেবীর অনেক মুর্তি বা ছবি, দেবী পদ্মের উপরে বসে আছেন দেখতে পাই, এমনকি গায়ত্রীদেবীর অনেক মন্দিরও হয়ে গেছে। যেহেতু সুর্যোদয়ের আগে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করতে হয় বলে অনেকে গায়ত্রীমন্ত্রকে সূর্য দেবতার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। কিন্তু গায়ত্রীমন্ত্রের অর্থকে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাব যে এই মন্ত্রের সাথে কোন দেব দেবীর কোন সম্পর্কই নেই।

বেলুড় মঠে যখন কেউ প্রবেশ করে তখন তাকে প্রথম তিন বছর সাধারণ ভাবে থাকতে হয়। তারপর দুই বছর ট্রেনিং সেন্টারে থাকে। ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ শেষ হয়ে যাওয়ার পর প্রত্যেককে উপনয়ন করিয়ে গায়ত্রীমন্ত্র দেওয়া হয়। সেদিন থেকে তাকে সকাল সন্ধ্যা ইষ্টমন্ত্র জপ করার মত গায়ত্রীমন্ত্রও জপ করতে হয়। কিন্তু সন্ন্যাস হয়ে যাওয়ার পর গায়ত্রীমন্ত্র আর জপ করতে হয় না। সন্ন্যাসীদের জন্য তখন আবার আলাদা একটি গায়ত্রীমন্ত্র দেওয়া হয়, যার নাম হচ্ছে পরমহংস গায়ত্রী। কিছু বিশেষ মন্ত্র আছে যা একমাত্র সন্ন্যাসীকেই দেওয়া হয়, সন্ন্যাসী ছাড়া অন্য কাউকে এই মন্ত্র দেওয়া হয় না। কোন সন্ন্যাসী কোন অবস্থাতেই কাউকে এই মন্ত্র বলবে না। কিন্তু এক সন্ন্যাসী অন্য সন্ন্যাসীকে বলতে পারে। এই মন্ত্র কোথাও লেখাও পাওয়া যাবে না। সন্ন্যাসীদের অন্যান্য যা মন্ত্র আছে তার সবটাই কোনটা এই বেদে কোনটা ঐ বেদে পাওয়া যাবে, কিন্তু এই বিশেষ মন্ত্রটি, যে মন্ত্রটি সন্ন্যাসীকে সন্ন্যাসী বানায়, সেটি কোথাও পাওয়া যাবে না। কেউ যদি বলে আপনি কিসের সন্ন্যাসী, গেরুয়া পড়ে যত চালবাজী করছেন। না, সন্ন্যাসী এই কারণে যে তিনি ঐ মন্ত্রটা জানেন। যাক, এগুলো আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।

বেলুড় মঠে যখন ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করা হয় তখন, যারা ব্রাহ্মণ বংশ থেকে এসেছেন তারা আগে থাকতেই গায়ত্রী মন্ত্র জানেন, তাদের কে নিয়েও আর সবাইকে গায়ত্রীমন্ত্র দেওয়া হয়। স্বামী গম্ভীরানন্দ যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন তিনি একবার এই রকম প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্রহ্মচারীদের গায়ত্রীমন্ত্র দিয়ে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করেছিলেন। সেই সময় একজন ব্রহ্মচারী গায়ত্রীমন্ত্র পাওয়ার পর স্বামী গম্ভীরানন্দজীকে জিজ্ঞেস করছেন 'মহারাজ, এই গায়ত্রীমন্ত্র জপ করার সময় ঠাকুরের ধ্যান করতে পারি কি'? স্বামী গম্ভীরানন্দজী তখন বলছেন 'হ্যাঁ, অবশ্যই ঠাকুরের ধ্যান করতে পার, যদি এই মন্ত্র থেকে তোমার মনে হয় এর ভাব গুলো ঠাকুরের সঙ্গে মিল খাচ্ছে তাহলে অবশ্যই করবে'। স্বামী গম্ভীরানন্দের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যটি আমাদের অনেকের দৃষ্টি খুলে গিয়েছিল। আমাদের মনের মধ্যে কথাগুলো চিরদিনের মত গেঁথে গিয়েছিল। আমরা ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছে যে গায়ত্রীদেবীকে দেখতে এই রকম, গায়ত্রীমন্ত্র হচ্ছে সূর্যোপসনা আরও কত কি শুনেছি। কিন্তু হঠাৎ গম্ভীর মহারাজ এই রকম কথা বললেন যে ঠাকুরকে যদি তোমার এর ভাবের সঙ্গে মিল দেখতে পাও তাহলে অবশ্যই ধ্যান করবে।

কিন্তু এর পরে আরও যেটা দৃষ্টি খুলে দিয়েছিল তা হল, যারা গম্ভীর মহারাজ থেকে ব্রহ্মচর্য পেয়েছিলেন, তাদের যখন সন্ন্যাস হয় তখন স্বামী ভূতেশানন্দজী ছিলেন মঠের অধ্যক্ষ। সন্ন্যাসের পর সন্ন্যাসীদের কিছু নির্দেশিকা দেওয়া হয়, তার মানে তুমি এখন সন্ন্যাসী হয়েছ এখন তুমি এই এই জিনিষ করবে, এই এই জিনিষ করবে না। সেই সময় একজন নতুন সন্ন্যাসী আনন্দ করে স্বামী ভূতেশানন্দজীকে বলছেন 'মহারাজ আর তো গায়ত্রীমন্ত্র জপ করতে হবে না'? মহারাজের এই কথা শুনে উনি খুব বিরক্ত হয়ে বলছেন 'গায়ত্রী জপ কেন করবে না? গায়ত্রী জপে তোমার কি সিদ্ধিলাভ হয়ে গেছে'? আসল ব্যাপার হচ্ছে, প্রথমে গুরুর কাছে ইষ্টমন্ত্র নিয়েছিল, সেই ইষ্টমন্ত্র জপ করতে হয়, তারপর ব্রহ্মচারী হয়ে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করছে, আবার সন্ন্যাসীর বিশেষ মন্ত্র আছে, সেটাও জপ করতে হয়। এখন মাঝখান থেকে স্বামী ভূতেশানন্দজী গায়ত্রীমন্ত্রটাকেও চালিয়ে যেতে বলে দিলেন। এর পর নতুন সন্ন্যাসীরা ভাইস প্রেসিডেন্ট মহারাজের কাছে গিয়ে বলছেন 'মহারাজ, স্বামী ভূতেশানন্দজী তো আমাদের গায়ত্রীমন্ত্রও জপ করতে বলে দিয়েছেন'। উনি কি শুনলেন ঠিক বোঝা গেল না কারণ তিনি বললেন 'উনি বলে দিয়েছেন তো গায়ত্রীমন্ত্র জপ করতে হবে না'। তখন সবাই বললেন 'না, তিনি তো জপ করতে বললেন'। ভাইস প্রেসিডেন্ট মহারাজও একটু যেন অবাক হয়ে গেছেন, কারণ সাধারণত জপ করতে বলা হয় না।

আবার বিকেলের দিকে মিটিং এর সময় মহারাজরা গিয়ে স্বামী ভূতেশানন্দজীকে বললেন 'মহারাজ আপনি কি গায়ত্রীমন্ত্র জপ করতে বলেছেন'? স্বামী ভূতেশানন্দজীর একটা বিশেষ হাসি ছিল, যে হাসিতে তিনি সব কিছুকে উড়িয়ে দিতেন। মহারাজের এই কথা শুনে উনি সেই হাসিটাকে মিশিয়ে বললেন 'তোমার কি সিদ্ধি হয়ে গেছে'? মানে, তুমি সন্ন্যাসীই হও আর যাই হও, যেখান থেকেই হোক তুমি একটা মন্ত্র নিয়েছিলে, এখন সেই মন্ত্রে তো তোমার সিদ্ধিই হল না, তাহলে তুমি মন্ত্রটা ছেড়ে দেবে কি করে। অধ্যক্ষ মহারাজের মন্ত্রের ব্যাপারে এই সিদ্ধান্তটি আমাদের অনেকেরই চোখ খুলে দিয়েছিল। কোন মন্ত্র যখন কোন গুরুর কাছে থেকে নেওয়া হয় তখন তার একটাই উদ্দেশ্য, তা হচ্ছে সেই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করা।

প্রত্যকে মন্ত্র একটা ভাবকে বহন করে। বিজ্ঞানের ভাষায় যখন CO_2 লেখা হয়ে গেল, তখন এই CO_2 অনেক কিছুকেই প্রতিনিধিত্ব করছে। এই CO_2 শুধু যে কার্বনডাই অক্সাইডকেই বোঝাচ্ছে তা নয়, এতে বলছে কার্বনের একটা এ্যটম আছে, অক্সিজেনের দুটো এ্যটম আছে, এর অন্য মলিকিউলের ওজন এত, এই ভাবে অনেক কিছু এই ছোট্ট CO_2 মধ্যে দিয়ে বলা হচ্ছে। ঠিক তেমনি যে কোন মন্ত্র, যেমন 'ওঁ নমঃ শিবায়' মন্ত্রে অনেক কিছু বলা হচ্ছে। কিন্তু এই যে CO_2 বলা হল, এটার মধ্যে শুধু কয়েকটা টেকনিক্যাল তথ্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যখন বলা হচ্ছে 'ওঁ নমঃ শিবায়' তখন এর মধ্য দিয়ে শুধু মামুলি কিছু তথ্য দিচ্ছে না, এই মন্ত্রের মধ্যে যে ভাবটা সুপ্ত আছে বাস্তবে সেই ভাবটাকে আমাদের প্রত্যক্ষ দর্শন করতে হবে। যেমন আমরা যখন CO_2 বলছি তখন আমরা ভালো ভাবেই জানি, কয়লাকে পোড়ালে CO_2 তে রূপান্তর হয়, যেটা আমরা যখন চাইব যখন ইচ্ছে হবে যে কাউকে দেখিয়ে দিতে পারি।

এখন যখন 'ওঁ নমঃ শিবায়' বলা হচ্ছে তখন বলা হয় এই মন্ত্র হচ্ছে শিবের প্রতিমুর্তি। একজন এসে বলছে, আপনি কি দেখেছেন সাক্ষাৎ শিব বসে আছেন? আমি তো দেখছি না। কিন্তু এই মন্ত্রের 'ওঁ' আর 'শিব' এই দুটোই এক। কিন্তু এটা আমরা শুনেছি কিন্তু অনুভব কি করেছি? হয়নি। তাহলে এই মন্ত্রটা একটা মামুলি তথ্যই রয়ে গেলে আমাদের কাছে। নবম বা দশম শ্রেণির ছাত্ররা যেমন ফিজিক্স কেমিস্ট্রির ফরমুলা মুখস্ত করে, মন্ত্রও আমাদের কাছে ঠিক সেই রকমের হয়ে গেছে। এই ভাবে আমরা তো মন্ত্রকে কোন কাজে লাগাতে পারছি না। কাজে লাগানো তো অনেক দূরের কথা, মন্ত্রের মধ্যে যে সত্যটা রয়েছে, বাস্তবে যা প্রত্যক্ষ করা যায়, সেই ব্যাপারে আমাদের কোন ধারণাই নেই।

ভিআইপি দের প্রোটেকশানের জন্য পুলিশদের এক ধরণের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। অনেক দিন ধরে এই প্রশিক্ষণ চলে। এখন প্রশিক্ষণের পর পুলিশদের পরীক্ষা নিয়ে দেখে নেওয়া হয় তারা ঠিক ঠিক প্রশিক্ষণ পেয়েছে কিনা। এই রকম একটা পরীক্ষাতে পুলিশদের প্রশ্ন করা হয়েছে 'প্রধানমন্ত্রীর কনভয় যাচ্ছে সেই সময় একটা আওয়াজ হল, এখন তুমি কি করে বুঝবে যে এটা কিসের আওয়াজ'? মানে যে আওয়াজটা হয়েছে সেটা বন্দুকের গুলির আওয়াজ, না বোমা ফাটার আওয়াজ, না পটকার আওয়াজ, না কোন গাড়ির টায়ার ফেটেছে, না কি কোন বোতল ফাটার আওয়াজ। তখন সঙ্গে একজন দাঁড়িয়ে বলছে 'স্যার, বইতে তিনটি পয়েন্টের কথা বলা হয়েছে'। সবাই হেসে উঠেছে, বইতে লেখা আছে সেটা জেনে আমার কি হবে। তোমাকে তো বাস্তবে আওয়াজ শুনে বুঝতে হবে এটা কিসের আওয়াজ। যারা খুব দক্ষ পুলিশ অফিসার তারা আওয়াজ শুনেই বলে দেবে কি ধরণের বন্দুকের থেকে গুলি বেরিয়েছে। একজন খুব নামকরা পুলিশ অফিসার বলছিলেন কি করে তারা বুঝতে পারেন। সেই অফিসারের এক বিয়ে বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছিল। তিনি তার বডিগার্ড সহ গেছেন অনুষ্ঠানে। বিয়ে বাড়িতে নানান ধরণের বাজি ফাটছে, সেই বাজির আওয়াজের মধ্যে হঠাৎ একটা ফায়ারিং এর আওয়াজও হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ওনার বডিগার্ডরা ছুটে এসে বলছে 'স্যার আওয়াজ হো গিয়া'। 'আওয়াজ হো গিয়া' মানে ফায়ারিং হয়েছে। ঐ পুলিশ অফিসার বিয়ে বাড়িতে নিমন্ত্রিত ছিলেন তিনি বলে দিলেন যে এখানকার থানার যে ইনচার্জ সে বুঝে নেবে। ওখানকার পুলিশ কিন্তু ব্যাপারটা ছেড়ে দিল না, পরের দিন পুলিশ খোঁজ নিয়ে জানল যে বিয়ে বাড়ির কেউ বরযাত্রিকে স্বাগত জানাতে আকাশে কয়েক রাউণ্ড ফায়ারিং করেছিলে। সেই পুলিশ অফিসার বলছিলেন তারা কি করে বুঝতে পারেন – বন্দুকের ফায়ারিং হলেই দুম্ করে প্রথমে আওয়াজ হলেও শেষে একটা মেটালিক টিং শব্দ হয়, এই মেটালিক টিং শব্দটাকে দিয়ে এনারা বুঝে নেন এটা রিভলবারের থেকে ছেড়েছে, না পিস্তল থেকে ছেড়েছে, না রাইফেল বা বন্দুক থেকে গুলি ছোঁড়া হয়েছে।

এখন ঐ পুলিশ কনস্টেবল যে বলছে কিতাব মে লিখা হ্যায়, এই রকম জেনে কি হবে। দীক্ষা নিয়ে মন্ত্রের ব্যাপারেও আমাদের এই একই অবস্থা। মন্ত্রের অন্তর্নিহিত সত্যকে যতক্ষণ না উপলব্ধি না হচ্ছে ততক্ষণ তার কোন মূল্য নেই। এখন গায়ত্রীমন্ত্রের আমরা দুটো দিক পেলাম, একটা স্বামী গম্ভীরানন্দজী যেটা বলেছেন আর দ্বিতীয় স্বামী ভূতেশানন্দজী যেটা বললেন। স্বামী ভূতেশানন্দজী বলছেন 'তোমার কি সিদ্ধি হয়ে গেছে যে তুমি মন্ত্র ছেড়ে দেবে'? আর স্বামী গম্ভীরানন্দজী বলছেন 'তুমি যদি মনে করে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে এই জিনিষগুলো রয়েছে তাহলে তুমি যখন গায়ত্রীমন্ত্র জপ করবে তখন তুমি ঠাকুরের ধ্যান করতে পার'।

গায়ত্রীমন্ত্রের প্রধান যেটা বৈশিষ্ট্য তা হচ্ছে গায়ত্রীমন্ত্র সম্পূর্ণ একটি নিরপেক্ষ, নির্বিশেষ ও নৈর্ব্যক্তিক মন্ত্র, অর্থাৎ কোন দেবী দেবতার সঙ্গে সম্বন্ধ নেই, আর অত্যন্ত শক্তিশালী মন্ত্র। মুসলমানদের যে প্রণাম মন্ত্র, লাইল্লা ইল্লাললাহা, এটাও খুব নির্বিশেষ মন্ত্র। মুসলমানদের এই মন্ত্রের মত গায়ত্রী মন্ত্রেও আধ্যাত্মিকতার যা যা গুণ আছে সব একত্রিত করা আছে।

গায়ত্রী মন্ত্রটি হচ্ছে – ***ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ***। গায়ত্রীমন্ত্রের প্রথমে ওঁ দিয়ে শুরু আবার শেষে ওঁ উচ্চারণ করে মন্ত্রকে বন্ধ করতে হয়। ওঁ

দিয়ে শুর করে ওঁ দিয়ে শেষ করে আবার ওঁ দিয়ে শুরু করতে হয়। যেমন 'ওঁ নমঃ শিবায় মন্ত্রে' প্রথমে একবার ওঁ বলে শুরু করতে হয়, শেষে আর ওঁ লাগায় না, কিন্তু গায়ত্রীমন্ত্রে দুটো ওঁ দিতে হয়।

গায়ত্রীমন্ত্রের শেষ অংশটা '*ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ*' এইটাই হচ্ছে প্রার্থনা, এখানে '*নঃ*' মানে হচ্ছে আমাদের। *প্রচোদয়াৎ* মানে হচ্ছে নিয়ে যাওয়া। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতীকের তলাতে যেমন লেখা আছে '*তন্নো হংসঃ প্রচোদয়াৎ*' – ঐ যিনি পরমহংস আছেন আমাদের যেন তিনি নিয়ে যান। গায়ত্রী মন্ত্রের এখানে একটু অন্য রকম মনে হবে – বলছেন *ধিয়ো* মানে ধি, বুদ্ধি, তিনি যেন আমাদের বুদ্ধিকে আলোকিত করেন। *প্রচোদয়াৎ* কথার প্রকৃত অর্থ আধ্যাত্মিক জগতে খুব জটিল। বর্তমান যুগের নিরিখে এই *প্রচোদয়াৎকে* আমরা আলোকিত করার অর্থে নিতে পারি – মানে আমাদের বুদ্ধিকে আলোকিত করে দাও। কিন্তু যারা ভক্ত তারা এই *প্রচোদয়াৎ*এর অর্থ অন্য রকম করে বলবেন – প্রভু আমাদের মনটাকে তোমার দিকে নিয়ে যাও। এটাও ঠিক অর্থ। গায়ত্রীমন্ত্রের এই শেষ লাইনটাতে জ্ঞান আর ভক্তির দুটোরই অর্থ করা যায়। *প্রচোদয়াৎ* দুটো অর্থেই লাগান যেতে পারে – একটা হচ্ছে আমাদের বুদ্ধিকে আলোকিত করে দাও, আমাদের বুদ্ধির শক্তি যেটা সেটা যেন বৃদ্ধি পায়, আরেকটা অর্থ করা যেতে পারে আমাদের বুদ্ধিকে যেন তিনি তাঁর দিকে টেনে নিয়ে যান।

মূল প্রার্থনা হচ্ছে – May we become divine. এখন আমাদের বুদ্ধিটা হচ্ছে জড়। খুব সাধারণ জিনিষকেই আমরা ধরতে পারিনা। মনের খুব সাধারণ ছোট ছোট আবেগ থেকেও বেরোতে পারিনা। বুদ্ধি মানে আমরা বুঝি একটা জিনিষ ঠিক সেটাকে জানা, আর যেটা ভুল সেটাকে ভুল বলে জানা, আসলে বুদ্ধি মানে তা নয়। বুদ্ধি মানে হচ্ছে যেটা ঠিক সেটাকে ধরে রাখা। ঠিক জিনিষটাকে শুধু জানলেই হবে না, সেই ঠিকটাকে ধরে রাখাই হচ্ছে বুদ্ধির ঠিক ঠিক অর্থ। আমাদের সমস্যা কি হয়, আমরা অনেক ভালো কথা, শাস্ত্রের কিছু ঠিক ঠিক কথা এখান ওখান থেকে শুনে থাকি, কিন্তু যেগুলো শুনলাম সেগুলো আমরা পালন করতে পারিনা, আর জীবনে প্রতিফলিত করতে পারিনা। করতে পারিনা কারণ আমাদের বুদ্ধি নেই। ঠিক জিনিষটাকে যাতে ধরে রাখতে পারি, সেই বুদ্ধিটা যাতে হয় সেইজন্য এই গায়ত্রীমন্ত্র জপ করা। এখন একটা ক্লাশ ফাইভের বাচ্চা ছেলেকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় দুইয়ে দুইয়ে যোগ করলে কত হবে? সে যদি বলে চার হবে। তাহলে বুঝতে হবে ছেলেটির বুদ্ধি আলোকিত হয়েছে, illumined mind, এখন যদি বলে দুই যোগ দুই পাঁচ, তাহলে বুঝতে হবে তার বুদ্ধিতে গোলমাল আছে। গায়ত্রীমন্ত্রে এই বুদ্ধির কথা বলা হচ্ছে না, এখানে যে বুদ্ধির কথা বলা হচ্ছে – এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি হবে যা দিয়ে জাগতিক বিষয়কেও বোঝার ক্ষমতা আর emotional life এ ঠিক জিনিষকে ধরে রাখা, তৃতীয় যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে যেটা আধ্যাত্মিক নয় সেটাকে বাদ দিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা। গায়ত্রীমন্ত্রের প্রার্থনাটা এই তিনটেকে একসাথে নিয়ে করা হয় – আমাদের বুদ্ধিকে তিনি প্রকাশিত করুন বা আমাদের বুদ্ধিকে তার দিকে নিয়ে যান। এইজন্য বেশির ভাগ জায়গায় যখনই গায়ত্রীমন্ত্রের অনুবাদ দেখা যায় তখন এই দুই ভাবেই দেখা যায়। যিনি গুরু বলে দিচ্ছেন তিনি তাঁর শিষ্যদের মত করে বলেন বলে গায়ত্রীমন্ত্রের অর্থের পার্থক্য হয়ে যায়। তাতে দোষের কিছু হয় না।

যারা পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র তাদের জন্য গায়ত্রীমন্ত্র খুব প্রয়োজন, যারা গৃহস্থ তাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, আর স্বামী ভূতেশানন্দজী সন্ন্যাসীকে বলে দিলেন – তুমিও গায়ত্রীমন্ত্র জপ কর। কেন বললেন? কারণ ব্রহ্ম আর মায়ার কথা আমরা সবাই শুনি, ব্রহ্ম যে কি বস্তু, মায়া যে কি বস্তু আমরা জানিনা, কিন্তু ব্রহ্ম আর মায়াকে তফাৎ করতে আমাদের শিখতে হবে। কিন্তু বুদ্ধি যদি জড় হয়, মন যদি অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে তাহলে এই ব্রহ্ম আর মায়া এই দুটোকে পৃথক করা আমাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তারজন্য দরকার মনের শক্তির। মনের শক্তির বিকাশ হতে পারে একমাত্র এই গায়ত্রীমন্ত্র জপের মধ্য দিয়ে।

এখন এই মন্ত্র দ্বারা আমরা কার কাছে প্রার্থনা করছি? প্রার্থনা যখন করা হচ্ছে তখন দুটো জিনিষকে নেওয়া হয়। যে দেবতার উদ্দেশ্যে এই প্রার্থনা করা হচ্ছে সেই দেবতার দুই ধরণের গুণকে

নেওয়া হয় – একটা হচ্ছে জাগতিক গুণাবলী আর আরেকটি হচ্ছে তাঁর আধ্যাত্মিকতার গুণগত দিক। প্রথমে বলা হচ্ছে *ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ* তারপরে বলছেন তৎ, তৎ মানে ঐ দেবতাকে এই প্রার্থনা করছি। আমরা যখন এর বাংলা বা ইংরাজীতে অনুবাদ করতে যাব তখন এর যে শব্দের বিন্যাসটা রয়েছে সেটা পুরোপুরি পাল্টে যাবে। এখন ওঁ শব্দের অর্থ আমরা জানি, ওঁ হচ্ছে ঈশ্বরের নাম, তারপরে আসছে *ভূর্ভুবঃ*, ভূর্ভুবঃ এর সন্ধি বিচ্ছেদ করলে হয় ভূঃ+ভুবঃ ও পরে স্বঃ আসছে। ভূঃ হচ্ছে এই পৃথিবী লোক, অর্থাৎ এই দৃশ্য জগৎ। স্বঃ এর অর্থ হচ্ছে স্বর্গলোক। নীচে ভূঃ লোক ওপরে স্বঃ স্বর্গলোক আর মাঝখানে হচ্ছে অন্তরীক্ষ লোক, যাকে বলা হয় ভুবঃ। এখন এই ভূঃ ভুবঃ আর স্বঃ এই তিনটেকে অন্য ভাবেও অর্থ করা যায় – ভূঃ হচ্ছে দৃশ্যলোক, ভুবঃ হচ্ছে মনোজগৎ এবং স্বঃ হচ্ছে আধ্যাত্মিক জগৎ। আমরা এখানে সোজাসাপ্টা যা অর্থ হচ্ছে সেটাকে ধরেই এগোব। ভূঃ, ভুবঃ আর স্বঃ এর অর্থ করছি ভূঃ পৃথিবীলোক যেখানে জীব বাস করে, স্বঃ স্বর্গলোক, যেখানে দেবতারা বাস করেন। আর মাঝখানে ভুবঃ অন্তরীক্ষলোক। এই ভুবঃ বা দ্যুলোক, যেটাকে অন্তরীক্ষ বলা হচ্ছে, শঙ্করাচার্য এর খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন, তিনি বলছেন যেখানে পাখিরা চলাচল করে সেটাই হচ্ছে ভুবঃ। এই তিনটি লোককে যিনি সৃষ্টি করেছেন বা এই তিনটে লোকের যিনি অধিপতি তাঁর কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হতে পারে এই তিনটে লোকের অধিপতি কে? এই তিনটে লোকের যিনি স্রষ্টা, তিনটে লোকের যিনি কর্তা, তিনটি লোকের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তিনি কে? যে কেউ হতে পারেন। এটা নির্ভর করছে আমি যাকে মনে করি তিনিই অধিপতি হবেন। প্রথমের দিকে আমরা যেটা বলেছি, পুরোপুরি নিরপেক্ষ ও নির্বিশেষ, যে কেউ এর অধিপতি, দেবতা, কর্তা, স্রষ্টা হতে পারেন।

প্রথম থেকে হিন্দুরা স্বভাবে হচ্ছেন সূর্যোপসাক। সেইজন্য প্রাচীন কাল থেকে গায়ত্রীমন্ত্রের সাথে সূর্য দেবতাকে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। তদুপোরি এইখানে যে প্রচোদয়াৎ শব্দটা বলা হয়েছে তাতে অর্থ করা হয়েছে আমাদের বুদ্ধিকে আলোকিত করা হোক। আলো বললে আমরা সূর্যকে মনে করি আর আলোর সাথে সূর্যের একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে আমরা সবাই ধরে নিই। সেইজন্য গায়ত্রীমন্ত্রে তারা সূর্যের উপাসনা করতেন। কিন্তু সূর্যের সঙ্গে গায়ত্রীমন্ত্রের কোন সম্পর্ক নেই। এখন যিনি গায়ত্রীমন্ত্র দিচ্ছেন তিনি যার উপর ধ্যান করতে বলবেন আমাদের সেই দেবতার উপরই ধ্যান করা উচিৎ। আর তা নাহলে গুরুকে জিজ্ঞেস করে নিতে হয় আমি অমুক দেবতা বা ইষ্টের উপরে ধ্যান করতে পারি কিনা। যার উপরেই আমি গায়ত্রীমন্ত্র জপের সময় ধ্যান করিনা কেন আমাকে মনে করত হবে তিনি এই তিনটে লোকের স্রষ্টা আর এর কর্তা বা অধীশ্বর।

তৎ শব্দটাও বেদ ও উপনিষদের উভয়েরই খুব প্রচলিত শব্দ। উপনিষদেই আমরা পাই বিখ্যাত মন্ত্র *তত্ত্বমসি* – তৎ ত্বম অসি, মানে সেটা তুমিই। তৎ মানে সেটা। আঙ্গুল দিয়ে নির্দেশ করে দেখিয়ে দিচ্ছে। সেটা কোনটাকে বলছে? তৎ হচ্ছে ভগবানেরই একটি নাম। গীতাতে আছে *ওঁ তৎসৎ ইতি নির্দেশো* (১৭/২৪), তৎ হচ্ছে ভগবানের দিকে ইশারা করে নির্দেশ করা। আবার তৎ হচ্ছে সেটা। আমরা ভগবান বলতে নারায়ণ বুঝি, বিষ্ণুকে বুঝি, কিন্তু এখানে তৎ বলতে ভগবানকে বোঝাচ্ছে। এখন তৎ বলতে ভগবানকে কেন বোঝাচ্ছে? আসলে ভগবানের কোন বিশেষণ নেই, তিনি হচ্ছেন নির্গুণ নিরাকার, আমরা আমাদের নিজেদের সুবিধার্থে তাঁকে কিছু বিশেষণ দিয়ে দিচ্ছি। উপনিষদে বলা হচ্ছে নেতি নেতি, অর্থাৎ ভগবানকে জানা হয় নেতি নেতি করে, ভগবান এটা নয়, এটা নয়। অথচ ভগবানকে বলা হচ্ছে সচ্চিদানন্দ। এখন সচ্চিদানন্দ বলতে বোঝাচ্ছে সৎ, চিৎ ও আনন্দ। সৎ মানে যিনি আছেন, কিন্তু আমি কি বুঝতে পারছি না আমি আছি? চিৎ মানে যার চেতনা আছে, বুদ্ধি আছে, তা আমি কি বুঝতে পারছি না যে আমার বুদ্ধি নেই? আর আনন্দ! একবার বিরিয়ানি খেতে পারলে আনন্দের কি শেষ আছে। তাহলে নেতি নেতি কিভাবে হবে। অর্থাৎ ঈশ্বর যে সৎ, তিনি যে চিৎ আবার তিনি যে আনন্দ স্বরূপ এই তিনটেরই আমাদের ধারাণা আছে। এই তিনটেকে আমি নেতি নেতি মানে তিনি সৎ নন, চিৎ নন, তিনি আনন্দ নন কখনই বলতে পারি না। আমি একটা জিনিষকে দেখে তার ব্যাখ্যা করছি, আমি একজনকে দেখে আনন্দ পাচ্ছি, সৎ, চিৎ ও আনন্দের ধারণা আমাদের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু বলছে ঈশ্বরকে নেতি নেতি করে জানা যায়। ঈশ্বরকে যে সৎ চিৎ আর আনন্দ বলা হচ্ছে এটা ঠিক আবার তাকে কোন নাম দিয়ে উপাধি দিয়ে

জানা যায় না, নেতি নেতি করে জানা হয়, এইটাও ঠিক। কিন্তু এই দুটোকে বিপরীত তত্ত্বকে মেলান যাবে কিভাবে? যুক্তিতে কোথাও এই দুটোর সাথে মিল থাকতে হবে। নেতি নেতি বলতে বোঝায় যা কিছু জগতে দেখছি তার সাথে ভগবানের কোন মিল নেই আবার এই জগতের সব কিছুর ব্যাপারে আমাদের যত রকমের ধারণা আছে তার সাথেও ভগবানের কোন মিল নেই। আসলে বলতে চাইছে ব্রহ্মই হচ্ছে সৎ আর বাকি সব অসৎ, আমি যে নিজেকে আছি বলে মনে করছি আসলে এর কোন অস্তিত্বই নেই, আসল সৎ তিনিই। ঠাকুর বলছেন ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু, তার মনে ঈশ্বরই সৎ বাকি সব অসৎ। আমি যেটাকে সৎ বলে জানছি, আমি যেটাকে সৎ বলতে বুঝি সেটা সৎ নয়, আমার মনের মধ্যে যে সৎ ধারণাটা রয়েছে সেই সৎ একমাত্র তিনি। আমিই অসৎ, সেই জন্য নেতি নেতি করে ঈশ্বরকে জানতে হয়। আমাদের কাছে থাকা মানে হচ্ছে শরীর মন, শরীর মন না থাকলে আমরা বলি নেই, কিন্তু যিনি ঈশ্বর তিনি শরীর মন নন, তিনি আলাদা। সেইজন্য মনে তিনি নেই, কিন্তু তিনিই আছেন। ঠিক তেমনি আমাদের কাছে চিৎ মানে হচ্ছে বুদ্ধি, আমাদের কারুর ডাক্তারি বুদ্ধি আছে, কারুর ম্যানেজমেন্ট বুদ্ধি আছে, কারুর কারিগরি বুদ্ধি আছে। কিন্তু এগুলো যে বুদ্ধিতে হচ্ছে সেই বুদ্ধিটা আসলে জড় আর ব্রহ্মের যে চিৎ সেটাই হচ্ছে প্রকৃত চেতনা। কারণ প্রকৃতি এলাকায় যা কিছু আছে সব জড়। আমাদের কাছে যেগুলো মন, বুদ্ধি এগুলো সব প্রকৃতির এলাকার বস্তু তাই এরা সবাই জড়। ব্রহ্মের যে বুদ্ধি সেটাই হচ্ছে চৈতন্য। এই যে টিউব লাইটের আলো এই আলোটা জড়ের আলো। কিন্তু যখন ব্রহ্মের জ্যোতির কথা বলা হয় তখন সেটাই হচ্ছে চৈতন্যের আলো। ঠাকুর মা ভবতারিণীকে 'মা তুই দেখা দিবিনি' বলেই তিনি গলায় খড়্গ চালাতে গেছেন। সেই মহূর্তে মা যেন তাঁর হাতকে ধরে ফেলেছেন, আর ঠাকুর দেখছেন চৈতন্যের জ্যোতি তাঁকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে, তিনি যেন এ জ্যোতির সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছেন। চৈতন্যের জ্যোতিটা যে কি, এটাকে আমরা কোনদিন বুঝতে পারব না, যে অনুভব করেছেন তিনিই একমাত্র বলতে পারবেন। আর এটা কাউকে বলে বোঝান যায় না।

প্রথমে আমার যা কিছু আছে, আমার শরীর, আমার মন, আমার বুদ্ধি, এগুলো সব জড়, কিন্তু এর ওপরে আমার একটা সত্তা আছে সেটাই হচ্ছে চৈতন্য। তৎ যখন বলা হচ্ছে তখন এই জিনিষটাকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। জগতের যা কিছু আছে তার ব্যাপারে আমার যে ধারণা আছে তার সাথে এর কখনই মিল খাবে না। মিল খাবে না বলে দূর থেকে আঙ্গুল দিয়ে ইঙ্গিত করে দেওয়া হচ্ছে। আঙ্গুল যখন দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে তখন এইটাই হয়ে যাচ্ছে নেতি নেতি, মানে এইখানে যা কিছু আছে এগুলোর সাথে এর কোন মিল নেই, তথাপি তিনি আছেন। শিশু মায়ের কোলে উঠে বলছে 'মা আমি চাঁদ দেখব'। মা তখন তার আঙ্গুলটাকে চাঁদের দিকে দিয়ে নির্দেশ করে বাচ্চাকে বলছে 'এই আঙ্গুলের ডগার দিকে তাকিয়ে সোজা আকাশের দিকে তাকাও, তাহলেই চাঁদকে দেখতে পাবে'। বাচ্চা নজর আঙ্গুলের নখ পর্যন্ত যাচ্ছে, চাঁদের দিকে নজর দিতে পারছে না। ঈশ্বরের সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয় সবই হচ্ছে এই আঙ্গুল দেখানো। যা কিছু বলা হচ্ছে সব হচ্ছে ইশারা করা। আমাদের সমস্যাটা ঐ বাচ্চার মত, ঈশ্বরের সম্বন্ধে যা কিছু বলা হচ্ছে সেগুলো দিয়ে ঈশ্বরের দিকে ইশারা করা হয়, যে জিনিষকে ইশারা করছে সেই জিনিষটাকে কেউ দেখছে না, আমরা ঈশ্বরের দিকে না দেখে সেই জিনিষগুলির দিকেই তাকাই, আঙ্গুলের নখটাকেই দেখছি। ঈশ্বরের সম্বন্ধে যখনই কোন শব্দ বলা হল তখন আমরা শব্দের উৎপত্তি, শব্দের কি বিন্যাস ইত্যাদি জিনিষকে নিয়েই মেতে থাকি। এখানে তৎ বলতে শুধু যে ঈশ্বর তা নয়, এই তৎ অনেক কিছুকে বোঝাচ্ছে। এই তৎ নারায়ণ বা বিষ্ণুর থেকে আরও অনেক কিছুকে বলছে। যখন আমরা নারায়ণ বা বিষ্ণুর কথা বলছি তখন আমরা নির্দিষ্ট একটা কিছুকে বলছি। প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে যিনি বাস করেন, যিনি জলের উপরে শয়ন করেন তিনি নারায়ণ, এখানে তাঁকে সাকার করে দিচ্ছি। কিন্তু যখন তৎ বলছি তখন তিনি নির্গুণ নিরাকার হয়ে গেলেন। নির্গুণ নিরাকার যখনই করে দেওয়া হল তখনই বুঝে নিতে হবে যে তাঁকে কোন কিছু দিয়ে বোঝান যাবে না। তাহলে কি তৎ কি শুধু নির্গুণ নিরাকারে জন্যই বলা হচ্ছে? কখনই না, এই তৎ শব্দ যেমন নিরাকার নির্গুণকে বোঝাচ্ছে ঠিক একই ভাবে তৎ সগুণ সাকারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। সগুণ

সাকারের যে গুণগুলি আরোপিত করা হচ্ছে এই গুণগুলো কোন জাগতিক গুণের কথা বলা হচ্ছে না, জাগতিক গুণগুলির থেকে সগুণ সাকারের গুণ একেবারেই আলাদা।

যদিও গায়ত্রীমন্ত্রে ভগবান বলছে না এখানে তৎ বলেই ছেড়ে দিয়েছে। এখন তৎ বলতে আমরা কাকে নেব? এই তৎ কে আমরা মা কালীকে নিতে পারি, দুর্গাদেবীকে নিতে পারি, শিবকে নিতে পারি, শ্রীরামকৃষ্ণকে নিতে পারি, আবার যদি বলি অহং ব্রহ্মাস্মি আমিই সেই, তখন আত্মাকে নিতে পারি। এইজন্য আমরা গায়ত্রীমন্ত্রকে বলছি নৈর্ব্যক্তিক। এই তৎ কে যদি ঠাকুর মনে করি তখন গায়ত্রীমন্ত্র জপের সময় ঠাকুরের ধ্যান করতে কোন আপত্তি হবে না।

গায়ত্রীমন্ত্রের *ভূর্ভুবঃ স্বঃ* এই প্রথম অংশে তৎ শব্দের দ্বারা জাগতিক প্রকাশের শক্তিটাকে বলা হয়ে গেল। ছন্দকে রাখার জন্য তৎ শব্দটাকে পরের লাইনে আনা হয়েছে। তারপরে বলা হচ্ছে *সবিতু*, সবিতুর অর্থ হচ্ছে যেটা জ্যোতিষ্মান। যেমন সূর্যের আরেকটি নাম হচ্ছে সবিতা, সবিতু হচ্ছে যিনি সূর্যের মত আলোকিত। ভগবান যিনি, তাঁকে সব সময় জ্যোতির্ময়ের সাথে সমীকরণ করা হয়, ঈশ্বরত্বকে কখনই অন্ধকারের সাথে গণ্য করা হয় না। সেইজন্য দেখতে পাই যখন ধ্যান করতে বলা হয় তখন বলে দেওয়া হয় হৃদয়ে যে জ্যোতি আছে তাকে সব সময় উদীয়মান সূর্যের জ্যোতি রূপে কল্পনা করে ধ্যান করবে। কারণ একটাই, ঈশ্বর আর জ্যোতি যেন এক হয়ে আছে, জ্যোতির সাথে ঈশ্বরকে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, সব সময় জ্বলজ্বল করছে। শুধু জ্বলজ্বল করছে না, এই জ্যোতি হচ্ছে সচল সজীব আলো। এই জিনিষটা ধ্যান করে সিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত বোঝা যায় না।

এখন আমরা ধ্যান করছি। কার উপর মনকে একাগ্র করছি? তাঁর উপর ধ্যান করছি যিনি এই ত্রিলোকের (ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ) প্রভু, যিনি স্বভাবে দেদিপ্যমান। এটা যে কোন অন্ধকার কালো মুর্তি তা নয়, আমরা যেমন মা কালী বলতে কালো অন্ধকারময় মুর্তির কথা ভাবি। কিন্তু ঠাকুর যখনই মা কালীর কথা বলছেন সব সময় তিনি চিন্ময়ীর কথা বলছেন। কারণ দেদিপ্যমান আর চৈতন্য এই দুটো পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত। তারপরে আসছে *বরেণ্য,* বরেণ্য হচ্ছে, যিনি শ্রেষ্ঠতম, যিনি হচ্ছেন একমাত্র বরণীয়, বরণ করার একমাত্র যোগ্য যিনি। গীতাতে দুটো কথা খুব ব্যবহার করা হয়েছে একটা হচ্ছে *মচ্চিত্তঃ* আর *মৎপরঃ*, মচ্চিত্তঃ মানে যার চিত্ত অর্থাৎ মনটা শ্রীকৃষ্ণময় হয়ে আছে। আর তার সাথে যিনি মনে করেন শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছে সর্বোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ – এইটাই হচ্ছে মৎপরঃ এর প্রকৃত অর্থ। এখানে বলা হচ্ছে বরণ্যেম্, এখন একটা মানুষের মন টাকা পয়সার দিকে যেতে পারে, মন ভোগের দিকে যেতে পারে, আমি জানি ভগবানই একমাত্র বরেণ্য কিন্তু আমার মন এখন ভোগকে বরণ করেছে। স্বামীজী বলছেন – When you make a compromise admit that you are making a compromise, but from that don't lower the ideal. তুমি যদি কোথাও compromise করতে বাধ্য হচ্ছে কর, কিন্তু তোমার আদর্শকে কখনই নীচে নামিয়ে দেবে না। তুমি বল আমি পারছি না, আমি দুর্বল, আমি মেনে নিচ্ছি কিন্তু আদর্শকে কখন ছোট করে দিও না। এইটাকেই গীতা বার বার বলছে মচ্চিত্তঃ ও মৎপরঃ। শঙ্করাচার্য এই মচ্চিত্তঃ আর মৎপরঃ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন – একটা ছেলে একটা মেয়েতে যখন অনুরক্ত হয় তখন তার চিত্তে মেয়েটিই সব সময় বিরাজ করে থাকে, কিন্তু সেও জানে যে ভগবান এই মেয়েটিরও ওপরে। ছেলেটি ভালো করেই জানে যে ভগবানই শ্রেষ্ঠ এই মেয়েটি কখনই শ্রেষ্ঠ নয়। এখানে এইটাকেই বলছে – হে ঠাকুর আমি তোমাকে পূজো করছি, আমি তোমাকে ধ্যান করছি। তা আমি কি তোমাকে পূজা করছি কটি টাকার জন্য? আমার দৃষ্টিভঙ্গীকে পাল্টাবার জন্য চেষ্টা করতে হবে। এই যে টাকা আছে, ধনদৌলত আছে, যত ভোগ্য সামগ্রী আছে, এ সবই তোমার দিকে যাওয়ার জন্য।

যারা সংসার ধর্ম করছে, কিসের জন্য সে সংসার ধর্ম করছে? আমার মনে কিছু একটা দুর্বলতা ছিল, আমি বিয়ে করে সংসার করলাম, আমার সন্তান হল, স্ত্রী-সন্তানের নিরাপত্তার কথা ভাবতে হবে। তার জন্য আমাকে অর্থোপার্জন করতে হচ্ছে। এই সবই হচ্ছে আমার জীবন-জীবিকাকে ঠিকঠাক রেখে সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে জীবনকে চালানোর প্রক্রিয়া। কিছু টাকা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে রাখলে আমার আর

খাওয়া পড়ার চিন্তা হবে না। এই প্রক্রিয়াকে ঠিক রেখে আমি এবার ভগবানের দিকে বেশি করে মন দেব। আমার সাধারণ খাওয়া পড়াতেই চলে যাবে, এখন আমি ভগবানে বেশি মন দিতে পারব। আমরা কিন্তু এর ঠিক উল্টোটাই করি। আমরা রোজ গিয়ে ভগবানকে ধরি, ধরে তাকে বলি – হে ঠাকুর, দেখো আমার সন্তানরা যেন ঠিক থাকে, আমার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সটা যেন বাড়তে থাকে, শেয়ার মার্কেট যেন ঠিক থাকে। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সংসারের কাঁধে দাঁড়িয়ে ভগবানকে ধরে রাখা। কিন্তু আমরা কি করছি? ভগবানের কাঁধে দাঁড়িয়ে সংসারটাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইছি। এই জন্যই আমাদের কষ্টের পর কষ্ট বেড়েই চলে। গায়ত্রীমন্ত্র এই জিনিষটাকেই কেটে দিতে বলছে, গায়ত্রীমন্ত্রে যে বরেণ্যং বলা হচ্ছে তা ভগবানকে বলা হচ্ছে, তাকে বরণ কর, একমাত্র তিনিই হচ্ছেন বরণীয়। কিন্তু আমরা সংসারকেই বরণ্যেম্ করে রেখেছি। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে দাঁড়িয়ে একজন বলছে – একবার নাতির চাঁদ মুখটা দেখে আসি, নাতির চাঁদ মুখ দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। ঠাকুর বলছেন – চাঁদ মুখ না পোড়ার মুখ। তাহলে কে আমাদের কাছে বরেণ্যম রয়ে যাচ্ছে? সংসার। কেন? ঠাকুরের কাঁধে দাঁড়িয়ে আমরা জগতকে বরেণ্য করতে যাচ্ছি। কিন্তু জগতের ঘাড়ে চেপে ঠাকুরকে ধরতে হবে। জগতের যা কিছু আছে সব কিছুই আমাদের মুক্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটেই হচ্ছে মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়ার জন। সংসারে থাকতে গেলে টাকার দরকার, আমি খেটেখুটে কিছু টাকা পেয়ে সেই প্রয়োজনটা মিটে গিয়ে আমার মনটা পরিষ্কার হয়ে গেল, এইবার আমি ঠাকুরকে ধরব। আমার একটু বাসনা ছিল, বাসনা মিটে গেছে, এখন আমি বাসনা থেকে মুক্ত, যেই এই ভাবটা এসে গেল তখন পুরো মনটা সেই বরেণ্যম যিনি, ঈশ্বরের দিকে ফেলে দিলাম। কিন্তু আমাদের কিছু টাকা হয়ে গেলে আরও টাকা কি করে হবে তার পেছনে ছুটতে থাকি, একটা দুটো বাসনা মিটে গেল আরও দশটা বাসনাকে টেনে পুরো মনটাকে সংসারে জড়িয়ে রাখছি।

বরেণ্যম কে? সেই তৎ। সেই তৎ টা কে? ভূঃ, ভুবঃ স্বঃ এই তিনটে লোক যিনি রচনা করেছেন, একমাত্র তিনিই হচ্ছেন বরেণ্য। এখন তুমি যদি না পার তাহলে বল আমি পারছি না, আমার মন এখনও ভোগে পড়ে রয়েছে, আমার মনে ভোগের ইচ্ছা এত প্রবল আমি পারছি না। ঠিক আছে তোমাকে পারতে হবে না। তুমি এই বরণ্যেমকে মেনে নাও, তার কথা ভাব, আর এই গায়ত্রীমন্ত্র জপ করে যাও। কোন সিনিয়র মহারাজদের কাছে কোন দুঃখ-কষ্টের কথা বলতে এলে ওনারা বলেন – তুমি নিজে মন্দিরে ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে সব জানাও, আর প্রার্থনা করে বল – প্রভু আমি পারছিনা, তুমিই একমাত্র বরণ্যেম তুমি আমাকে শরণাগতি দাও। তোতা পাখির মত, টেপরেকর্ডারের মত বলতেই থাক। এই ভাবে বছরের পর বছর বলতে থাক। দশ বছর, পনের বছর, তিরিশ বছর ধরে যখন সকাল সন্ধ্যা ঠাকুরের সামনে মাথা ঠুকে ঠুকে বলতে থাকবে ঠাকুর আমায় শরণাগতি দাও। তখন হঠাৎ একদিন তোমার মনের একটা দরজা খুলে যাবে আর তুমি নিজের মনেই বলবে যে – এতদিন আমি ঠাকুরের কাছে শরণাগতি চাইছিলাম, এতদিন আমি এই প্রার্থনা করছিলাম, ওঃ এখন বুঝলাম, শরণাগতি হচ্ছে এই। যখন এই বোধটা আমাদের মধ্যে এসে যাবে তখন আমরা বুঝতে পারব যে আমাদের মধ্যে চৈতন্য শক্তি সুপ্ত হয়ে ছিল সেটা চলতে শুরু করেছে। তার মানে আজ হোক কিংবা কাল হোক আমাদের শরণাগতি হবেই হবে, কেউ একে আটকতে পারবে না। যন্ত্রের মত যে প্রার্থনাটা করা হচ্ছিল সেটাও যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে কোন দিনই তার আর হবে না, সে আরও সংসারের আবর্তে জড়িয়ে পড়তে থাকবে।

একজন মহারাজের জীবনের একটা ঘটনা আছে যেটা আমাদের কাছে খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। প্রথম জীবনে তিনি ব্রহ্মচারী হয়ে মঠে জয়েন করেছিলেন। তার কিছু দিন পরেই কোন কারণে হোক তিনি ঠিক করে নিলেন যে মঠ ছেড়ে সংসারে ফিরে যাবেন। অনেক আগেই একটি মেয়ের সাথে তার বিয়ের সম্বন্ধ করা হয়েছিল, সেই মেয়েটিকেই বিয়ে করবেন ঠিক করে ফেলেছেন। দুই তিন দিন পরেই বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। আজকেই মঠ ছেড়ে চলে যাবেন। সে নিজের সেন্টার ছেড়ে জয়রামবাটী মঠে চলে এসেছে। জয়রামবাটীতে এসে মায়ের মন্দিরে প্রণাম করে বলছে – মা তোমাকে ছেড়ে চললাম, সংসারে ফিরে যাচ্ছি, বিয়ে করব। অনেক আগেকার ঘটনা। মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে এক সিনিয়র মহারাজকেও প্রণাম করে বলছে – মহারাজ, আমার দ্বারা মঠে থাকা হল না, আমি আজকেই মঠ ছেড়ে চলে যাচ্ছি, দুই

দিন পরে আমার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। তখন সেই মহারাজ তাকে বলছেন – বিয়ে করতে যাচ্ছ, ঠিক আছে যাও। যেখানেই থাক মায়ের সঙ্গে যে সম্পর্ক সেটা চিরদিনের সম্পর্ক এই কথাটা মনে রেখো, আর বিয়ে থা করে আর কখন সুযোগ হবে কি হবে না ঠিক নেই তাই যাওয়ার আগে তুমি আমার কথা মত মায়ের মন্দিরে মায়ের সামনে পনের মিনিট একটু গিয়ে চুপচাপ বস।

সিনিয়র মহারাজের কথা মত মন্দিরে গিয়ে পনেরো মিনিট বসে রইল। পনেরো মিনিট পরে উঠে এসে জয়রামবাটি মন্দিরের অধ্যক্ষকে গিয়ে বলছে – মহারাজ, আমি বিয়ে করব না। মঠ ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। আমার জীবনে একটা বিরাট ভুল হয়ে যাচ্ছিল। এই ঘটনাটা তিরিশ বছর আগেকার, তিনি এখনও সন্ন্যাসী হয়ে বেলুড় মঠে আছেন। তিনি কি এর আগে মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করেননি? করেছেন নিজের মত গেছেন যান্ত্রিক ভাবে প্রার্থনা করে বেরিয়ে এসেছেন। কিন্তু সেদিন এক সিনিয়র মহারাজের কথায় মন্দিরে গেছেন, এতদিন যেটা মেকানিক্যাল প্রার্থনা ছিল সেটা খট্ করে খুলে গিয়ে চৈতন্য হয়ে গেল। ঠিক সেই রকম গায়ত্রীমন্ত্র মেকানিক্যাল ভাবে জপ করে যাচ্ছি, সেখানে বরেণ্যম্ বলছি, কিন্তু আমার কাছে ঈশ্বর ছাড়া সব কিছুই বরন্যেম্, আমার ছেলে বরেণ্যম, আমার মেয়ে বরেণ্যম, আমার টাকা বরেণ্যম্, আমার গাড়ি-বাড়ি, মান-সম্মান সব বরেণ্যম। ভগবানকে তো আমি চাকর বানিয়ে রেখেছি। চাকরকে যেমন বলি – এই তুই দাঁড়া আমি তোর ঘাড়ে উঠে আমড়া পাড়ব, আমরাও ভগবানের কাঁধে পা দিয়ে আমড়া পাড়ছি, আমড়া হচ্ছে আমার সন্তান, আমার স্ত্রী, আমার স্বামী, আমার টাকা-পয়সা, মান-সম্মান যাবতীয় জিনিষ।

তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্ এর পরে বলা হচ্ছে *ভর্গো*, ভর্গো মানে হচ্ছে আলো, সবিতুর অর্থও হচ্ছে আলো। কিন্তু সবিতুর আলোটাকে বোঝায় দেদিপ্যমান, জ্বলজ্বল করছে সব সময়। ভর্গোর যে আলো সেটা বোঝাচ্ছে অন্ধকারকে দূরীভূত করাকে। ভর্গো আর সবিতুর মধ্যে অনেক মিল আছে। গায়ত্রীমন্ত্রের প্রার্থনটা হচ্ছে *ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ*, আমার বুদ্ধিকে আলোকিত কর। তিনি হচ্ছে জ্যোতির্ময়, জ্যোতিষ্মান, আবার তিনি অন্ধকারকে সরিয়ে দেন। তিনি হচ্ছেন সবিতু আর তিনি হচ্ছেন ভর্গো, তিনি সেই আলোর প্রভু যে আলো অন্ধকারকে দূর করে দেন। তারপরে বলছেন *দেবস্য*, দেবস্য মানে হচ্ছে দেবতা, তিনি হচ্ছেন সমস্ত দেবতাদের দেবতা, শ্রেষ্ঠ প্রভু। *ভূঃ ভুবঃ স্বঃ* এই তিন লোকের প্রভু যিনি তিনিই *দেবস্য*, সব কটি বিশেষণ পরস্পরের সাথে এক হয়ে আছে। তৎ, যিনি ভগবান তাঁর ওপরে এই এই বিশেষণ গুলো আরোপিত করা হয়েছে। প্রথম বিশেষণ হচ্ছে তিনি এই ত্রিলোকের রচয়িতা, প্রভু। দ্বিতীয় বিশেষণ হচ্ছে মনোজগতের ব্যাপার, তিনি বরেণ্যম্। তার পরে পরে বিশেষণ গুলো হচ্ছে তিনি সবিতু, তিনি ভর্গঃ এবং তিনি দেবস্য।

ধীমহি হচ্ছে – আমরা তাঁকে ধ্যান করি। এখানে অহং ধীমহি বলতে পারি, মানে আমি ধ্যান করছি। ধীমহিতে যেটা ধ্যানের কথা বলা হচ্ছে এটা প্রার্থনার জন্য বোঝাচ্ছে। আমরা যখন কারুর প্রশংসা করি তখন বলি আমি তোমার কথাই চিন্তা করছিলাম। মানে আমার মন তোমার উপরেই একাগ্র করছি, অথবা আমার মনটা তোমার উপরেই পুরোপুরি পড়ে রয়েছে। বরেণ্যম্ বলা হচ্ছে মৎপরঃ এই ভাবকে নিয়ে আসার জন্য আর ধীমহি মৎচিত্ত এই ভাবকে প্রকাশ করছে। আপনি যে শুধু বরেণ্যম্ তাই নয়, বরেণ্যম্ বলেই ছেড়ে দিচ্ছি না, আপনাকে আমি আমার মনে ধরে রেখেছি। গীতাতে এই সুন্দর ভাবটাকে বলা হচ্ছে মৎপরঃ আর মৎচিত্তঃ তে, তুমিই শ্রেষ্ঠ আবার তোমাতেই আমার মন, এই দুটোই এসে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন – তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা। ধ্রুবতারাটা হচ্ছে বরেণ্যম্ আর তোমারেই করিয়াছি যেটা সেটাই হচ্ছে ধীমহি।

বিল গেটস্ পৃথিবীর সব থেকে ধনী লোক, তাতে আমার কি, ভগবান হচ্ছেন ত্রিলোকের স্রষ্টা, তাতে আমার কি। আমার কাছে তিনি এই যে আমি তাঁরই ধ্যান করছি, ধ্যান করা মানে আমার মনটা তাঁর চিন্তা দিয়েই ভরিয়ে দিচ্ছি, যিনি এই সব কিছুর রচয়িতা, যিনি আলোকময়, সবিতু, যিনি ভর্গো অর্থাৎ যিনি অজ্ঞান অন্ধকারকে সরিয়ে দিয়ে আমাদের অন্তরকে আলোকিত করে দেন, মানে যিনি এই জগতকে আলো

দিচ্ছেন আবার মনেও আলো দিয়ে আমাদের অন্তর জগতকে উদ্ভাসিত করে দেন, আর যিনি হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ, বরেণ্যম। বিল গেটস্ সবথেকে ধনী হতে পারেন কিন্তু আমি বিল গেটসের ধ্যান করতে যাচ্ছি না।

আমরা কেন তাঁর ধ্যান করছি? আমার যে ধী, মানে আমার যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধিকে তিনি যেন প্রচোদয়াৎ, আমার বুদ্ধিকে তিনি যেন তাঁর দিকে এগিয়ে দেন। তাঁর দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া মানে, আলোকিত কর, প্রকাশিত কর। সূর্যের যত কাছে যাব ততই সূর্যের আলো বেশি বেশি করে প্রকাশ হতে থাকবে। কিন্তু এখানে যে আলোর কথা বলা হচ্ছে সেটা সূর্যের আলো নয়, সবিতু আর ভর্গো তে যে জ্যোতির কথা বলা হচ্ছে সেই জ্যোতির আলোতে আমাকে প্রকাশিত, আলোকিত করার অর্থ হচ্ছে, যত ভুল জিনিষ আছে, বিশেষ করে আমাদের জাগতিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে জানার ক্ষেত্রে ভুলটাকে ধরে ফেলব, মনের জগতে আমি আর আজেবাজে জিনিষে নিজেকে আবদ্ধ করব না, আর আধ্যাত্মিক জগতে ঠিক ঠিক অধ্যাত্ম পুরুষে রূপান্তরিত হয়ে যাব। সকাল-বিকাল গায়ত্রীমন্ত্র জপের সাথে সাথে যদি কেউ এই ভাবে ধ্যান করে তাহলে সত্যি সত্যি এই তিনটে জিনিষই হয়। যদি বলেন ধ্যান না করে শুধু গায়ত্রীমন্ত্র জপে কি কিছু হবে না, আবার কি ধ্যানও করতে হবে? একটা কথা বলে দেওয়া ভালো যে শুধ জপে কিছুই হয় না। ঠাকুর বলছেন কোলকাতা অনেক ধরণের মেয়েরাও লক্ষ লক্ষ জপ করছে কিন্তু কিছুই হয় না। কেন হয় না? যতক্ষণ না আধ্যাত্মিক অনুভূতির জায়গাটা না খুলছে ততক্ষণ কিছুই হবে না, আর এইটা খোলে একমাত্র ধ্যানে। তবে ইষ্টমন্ত্র, গায়ত্রীমন্ত্র যদি মেকানিক্যালিও করা যায় তাহলে অনেক দিন ধরে করতে করতে একটা সময় ঐটা ঝট্ করে খুলে যায়, কিন্তু অনেক দিন ধরে লেগে থাকতে হয়। এই খুলে যাওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকাটাই হচ্ছে জীবনের উদ্দেশ্য। যার একবার খুলে গেলে তখন তার ভেতরে অনন্ত শক্তি জাগ্রত হয়ে যাবে। যখন ধ্যান করা হয় তখন পুরো মনটা গায়ত্রীমন্ত্রের সেই তৎ এর দিকে একাগ্র হয়ে আছে, সেই তৎ কে এর আগে আমরা দেখলাম। সেই জ্যোতির ধ্যান করতে করতে হঠাৎ করে তার বুদ্ধিটা খুলে যায়, তখনই সে উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই জগৎ তো বুদ্ধির জোড়েই চলছে, তাই এই বুদ্ধি যার আলোকিত হয়ে যায়, তখন তার কথাতেই সবাই চলবে।

গায়ত্রীমন্ত্রের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই মন্ত্র পুরোপুরি নৈর্ব্যক্তিক মন্ত্র, এই মন্ত্রে যিনি এই ত্রিলোকের স্রষ্টা, শ্রেষ্ঠ পুরুষ, জ্যোতির্ময় পুরুষ, তাঁর কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে আমাদের বুদ্ধি ও মনকে আলোকিত করুন। মন ও বুদ্ধি আলোকিত হওয়াটা ঠিক টাকা পয়সা পেয়ে যাওয়ার মত। আমি যদি আমার বাড়ি থেকে অনেক ভাত, মাংস হাড়ি করে নিয়ে কোথাও যাই তা আমি সেগুলো কত দূর নিয়ে যেতে পারব, হাওড়া স্টেশন যেতে না যেতেই সেগুলো পচে যাবে। আবার যখন জামা-কাপড় নিয়ে যাই তাহলে কত দিনের জন্য নিয়ে যেতে পারব? কিছু দিনের জন্য। কিন্তু আমার যদি প্রচুর টাকা থাকে তাহলে যত দূর খুশি ঘুরে বেড়াতে পারব, যত দিন আমি থাকব ততদিনই এই টাকার মূল্য নষ্ট হবে না বা পচে যাবে না। গায়ত্রীমন্ত্র হচ্ছে ঠিক এই নোটের মত। গায়ত্রীমন্ত্রতে যার সিদ্ধি হয়ে গেল সে তখন বিরাট ক্ষমতাশালী হয়ে গেল, টাকা দিয়ে যেমন আমি খাবার কিনতে পারি, কাপড় কিনতে পারি, বাড়ি বানাতে পারি, গায়ত্রীমন্ত্রে সিদ্ধি পেয়ে গেলে সে যে কোন ক্ষেত্রে তার এই সিদ্ধিকে কাজে লাগাতে পারবে। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে যা যা জিনিষের দরকার সব কিছুই গায়ত্রীমন্ত্রে আছে। তাই আজও কত যুগ ধরে ভারতের হাজার হাজার কোটি কোটি লোক এই গায়ত্রীমন্ত্র জপ করে আসছে।